প্রথম অধ্যায়

সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের অর্থনীতিকে টেকসই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছে। বিগত পাঁচ বছরেরও অধিক সময় অব্যাহতভাবে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬ শতাংশের ওপর অর্জন সম্ভব হয়েছে। ২০০৭ সালে দু'বার উপর্যুপরি বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় 'সিডর' -এ বাংলাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় এবং আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত জ্বালানির মূল্য রেকর্ড পর্যায়ে বৃদ্ধি বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশের আমদানি ব্যয়ের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব এবং অন্যদিকে দোহা রাউন্ড আলোচনার দীর্ঘসূত্রতা, বিকাশমান অর্থনীতির দেশসমূহের ক্রমবর্ধমান প্রবৃদ্ধি ও ব্যাপকভিত্তিক বাজার সম্প্রসারণ ইত্যাদি প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য পরিস্থিতি সন্তোষজনক পর্যায়ে রয়েছে। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি, রেমিট্যান্স প্রবাহের অব্যাহত অগ্রগতি, চলতি হিসাবের অনুকূল ভারসাম্য বৈদেশিক লেনদেনের (বিওপি) পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল পর্যায়ে রাখতে সাহায্য করেছে। সামষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি সরকার সামাজিক ও মানব সম্পদ উন্নয়নে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সম্প্রতি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক প্রকাশিত 'Bangladesh Quarterly Economic Update, মার্চ ২০০৮' প্রতিবেদনে বাংলাদেশকে বিশ্বব্যাপী ১৩টি উদীয়মান দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাদের দ্রুত প্রবৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের এই মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে।

প্রবৃদ্ধি, সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো চলতি অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬.২ শতাংশ হবে বলে সাময়িকভাবে প্রাক্কলন করেছে। কৃষি খাতে বিশেষ করে শস্য উপ-খাতে প্রবৃদ্ধির হার গত অর্থবছরের তুলনায় কম হওয়ায় এ অর্থবছরের সার্বিক প্রবৃদ্ধির হার কিঞ্চিৎ হ্রাস পাবে। অন্যদিকে, পশু সম্পদ খাতেও প্রবৃদ্ধি হ্রাস পাবে। বৃহৎ শিল্প খাতের মধ্যে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প খাতে ৭.৪২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৯.৭২ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে স্থির মূল্যে বৃহৎ সেবা খাতের মোট অবদান ৪৯.৪৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রথমবারের মত মাথাপিছু জিডিপি ৫০০ মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে গেছে। সাময়িক হিসাব অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে মাথাপিছু জিডিপি ও মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়াবে যথাক্রমে ৫৫৪ মার্কিন ডলার এবং ৫৯৯ ডলার। সঞ্চয় ও বিনিয়োগের পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে সাময়িক হিসাব অনুযায়ী দেশজ ও জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমাণ জিডিপির শতকরা হারে যথাক্রমে ২০.০৮ শতাংশ ও ২৯.২৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ হার ছিল যথাক্রমে ২০.৩৫ শতাংশ ও ২৮.৬৬ শতাংশ। বিনিয়োগের হার ২০০৬-০৭ অর্থবছরের ২৪.৪৬ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ২৪.১৬ শতাংশে দাঁড়াতে পারে। এর মধ্যে সরকারি খাতের অবদান ৫.০১ শতাংশ ও বেসরকারি খাতের অবদান ১৯.১৫ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ অবদানের হার ছিল যথাক্রমে ৫.৪৫ শতাংশ ও ১৯.০২ শতাংশ।

মূল্যস্ফীতি

জ্বালানি তেলের মূল্য বৃদ্ধি ছাড়াও আন্তর্জাতিক বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্য যেমন চাল, ডাল, গম, সয়াবিন তৈল ইত্যাদির মূল্য রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশে আমদানি নির্ভর এ সকল পণ্যের মূল্যে উর্ধ্বগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী চাল, ডাল ও গমের উৎপাদন হ্রাস পাওয়ায় এদের সরবরাহ কমে যাচ্ছে। সম্প্রতি কিছু কিছু কৃষি পণ্যকে উন্নত দেশে জ্বালানি তৈরীর কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করায় সংকট আরো ঘনীভূত হচ্ছে। ফলে মূল্যস্ফীতির হার ২০০৫-০৬ অর্থবছরের ৭.১৭ শতাংশের তুলনায় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৭.২২ শতাংশে উপনীত হয়েছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই মাসে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ভিত্তিতে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ১০.১০ শতাংশ, যা মার্চ ২০০৮ মাসে হ্রাস পেয়ে

দাঁড়ায় ১০.০৬ শতাংশে। তন্মধ্যে খাদ্য ও খাদ্য বহির্ভূত মূল্যস্ফীতি যথাক্রমে ১১.৭৯ শতাংশ ও ৭.৩৩ শতাংশ। মূল্যস্ফীতির উর্ধ্বমুখী ধারা রোধে নিত্য প্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করে দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে খোলাবাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী বিক্রির ব্যবস্থা, বাজার মনিটরিং, মজুদদারী রোধসহ নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি সংযত মুদ্রানীতি গ্রহণ করে মূল্যস্ফীতিকে সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সরকার সচেষ্ট রয়েছে।

রাজস্ব খাত

দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সুষ্ঠু রাজস্ব নীতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দারিদ্র বিমোচন, কৃষিখাতকে অধিকতর গতিশীল করা, বাস্তবমুখী শিল্পের প্রসার ও রপ্তানি বৃদ্ধি, দেশজ শিল্পের বিকাশ, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি লক্ষ্যকে সামনে রেখে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রশাসনিক পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৪৩,৮৫০.০০ কোটি টাকা। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাধীন খাতসমূহ হতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ৩৭,২১৯.৩২ কোটি টাকা। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম দশ (জুলাই এপ্রিল'০৮) মাসে আদায় হয়েছে ৩৫৩১৩.৪২ কোটি টাকা, যা বিগত অর্থবছরের (জুলাই-এপ্রিল'০৭) একই সময়ের তুলনায় ৬৬৫২.৭৫ কোটি টাকা বা ২৩.২১ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের (২০০৭-০৮) প্রথম দশ মাসে (জুলাই-এপ্রিল'০৮) মোট রাজস্ব আদায়ে লক্ষ্যমাত্রার ৮০.৫ শতাংশ অর্জিত হয়েছে।

২০০৬-০৭ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী মোট রাজস্ব জিডিপির অনুপাত ছিল ১০.৬ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ অনুপাত ১১.১৭ শতাংশ হয়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেট অনুযায়ী মোট সরকারি ব্যয়ের পরিমাণ ছিল জিডিপি'র ১৪.৩০ শতাংশ এবং চলতি অর্থবছরে তা ১৭.২৭ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপি'র আকার ছিল ২১৬০০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১৭৯১৭ কোটি টাকা, যা সংশোধিত বরাদ্দের ৮৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি'র আকার দাঁড়িয়েছে ২২৫০০ কোটি টাকা। এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে সংশোধিত বরাদ্দের ৫৫ শতাংশ।

২০০৬-০৭ অর্থবছরে বৈদেশিক অনুদান ব্যতিত সার্বিক বাজেট ঘাটতি ছিল জিডিপি'র ৩.৭ শতাংশ। বৈদেশিক অনুদানসহ এ ঘাটতি জিডিপি'র ৩.৩ শতাংশ। চলতি অর্থবছরে সার্বিক বাজেট ঘাটতি বৈদেশিক অনুদান ব্যতিরেকে ৬.১ শতাংশ ও বৈদেশিক অনুদানসহ ৫.৩ শতাংশ। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি)-র দায় সরকার কর্তৃক বহন করার কারণে বাজেট ঘাটতি বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘাটতি অর্থায়নে ২০০৬-০৭ অর্থবছরে নীট বৈদেশিক ও অভ্যন্তরীণ অর্থায়নের অংশ যথাক্রমে জিডিপি'র ১.৮ শতাংশ ও ১.৯ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে নীট বৈদেশিক অর্থায়ন জিডিপি'র ২.৪ শতাংশ এবং নীট অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন জিডিপি'র ৩.৭ শতাংশ।

বৈদেশিক খাত

চলতি অর্থবছরে দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে উর্ধ্বগতির ধারা পরিলক্ষিত হয়েছে। রপ্তানি পণ্যের মধ্যে তৈরি পোশাকের প্রবৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে নীটওয়্যার পোশাকে ১৯.৩০ শতাংশ এবং ওভেন পোশাকে ১৪.০৫ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই'০৭-মার্চ'০৮) পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় নীটওয়্যার পোশাকে ১৭.৩৪ শতাংশ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে এবং ওভেন পোশাকে প্রবৃদ্ধির পরিমাণ ৭.৫৪ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ ১২১৭৭.৮৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরের রপ্তানি আয়ের চেয়ে ১৫.৬৯ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে মোট রপ্তানি আয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১০১৫৯.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের রপ্তানি আয়ের তুলনায় ১২.৪৩ শতাংশ বেশি।

উল্লেখ্য, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে মোট আমদানি ব্যয় (সিআইএফ) দাঁড়ায় ১৭১৫৬.৮০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের আমদানি ব্যয়ের তুলনায় ১৬.৩৫ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই'০৭-ফেব্রুয়ারি'০৮) মোট আমদানি ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ১৩৩৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের আমদানি ব্যয়ের তুলনায় ২১.০৪ শতাংশ বেশি।

২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (সাময়িক হিসাব) দেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৩৯২১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ ঘাটতির পরিমাণ ছিল ২৩৭৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে চলতি হিসাবে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৯০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী অর্থবছরে একই সময়ে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৬০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে সাময়িক হিসেবে ২১৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যেখানে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে উদ্বৃত্তের পরিমাণ ছিল ৮০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উল্লেখ্য, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে রেমিট্যান্স খাতে দেশ ৫৯৭৮.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার আয় করেছে, যা পূর্ববতী বছরের তুলনায় শতকরা ২৪.৫০ ভাগ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে রেমিট্যান্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৫৬৪৯.২৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ২৯.৫৩ ভাগ বেশি। পরিস্থিতির আরও উন্নতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বহিঃখাতে যৌক্তিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। অবশ্য তা নির্ভর করবে রপ্তানি সম্ভাবনার বাস্তবায়ন, রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধির বর্তমান হার ধরে রাখা এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সন্তোষজনক পর্যায়ে রাখার উপর।

২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার জনশক্তি বিদেশে গমণ করেছে, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় ৫১ শতাংশ বেশি। চলতি অর্থবছরের প্রথম নয় মাসে (জুলাই'০৭-মার্চ'০৮) ৬ লক্ষ ৫৯ হাজার জনশক্তি বিদেশে গমন করেছে। জনশক্তি রপ্তানিতে আধাদক্ষ ও দক্ষ জনশক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি এবং রেমিট্যান্স প্রেরণ পদ্ধতি ও সেবার মান বৃদ্ধির কারণে প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এ ধারা আগামীতে অব্যাহত থাকবে বলে আশা করা যায়।

২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথমার্ধে পেট্রোলিয়ামসহ অন্যান্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, আমদানি ব্যয়ের উচ্চ প্রবৃদ্ধির বিপরীতে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির শ্লথ গতির কারণে বাজারে চাহিদার তুলনায় মার্কিন ডলারের সরবরাহ কম থাকে। ফলে টাকা-ডলার বিনিময় হার বৃদ্ধির প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়, যা দেশে বিরাজমান মূল্যস্ফীতি পরিস্থিতিকে আরো প্রকটতর করতে পারে বলে শংকার সৃষ্টি হয়। এরূপ পরিস্থিতির বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ডলারের চাহিদার ভারসাম্য রক্ষায় আন্তঃব্যাংক বাজারে প্রয়োজন অনুযায়ী ২০০৭ সালের অক্টোবর থেকে ডলার বিক্রির মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করে। অর্থবছরের দ্বিতীয়ার্ধে রপ্তানি প্রবৃদ্ধিতে গতি সঞ্চারিত হয় এবং প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিট্যান্সের দৃঢ় প্রবৃদ্ধি অর্জনের ফলে বাজারে বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহে গতিশীলতা আসলেও ভয়াবহ সিডরের ক্ষয়ক্ষতির প্রভাবে বর্ধিত আমদানি বিশেষ করে চাল আমদানির কারণে বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলাদেশ ব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখতে বাজারে ডলার বিক্রি অব্যাহত রাখে। উল্লেখ্য, ২৯ অক্টোবর ২০০৭ থেকে এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তঃব্যাংক বাজারে ৫৮৫.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিক্রি করে। অন্যথায় টাকার অবচিতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি হার আরও বৃদ্ধি পেত। আন্তঃব্যাংক বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় বাজারে মার্কিন ডলারের সাথে টাকার ভারিত গড় বিনিময় হার জুন ২০০৭ শেষে ছিল ৬৮.৮০ টাকা । মার্চ ২০০৮ শেষে এ হার ৬৮.৫৮ টাকায় দাঁড়ায়।

মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে (জুলাই-ফেব্রুয়ারি) ব্যাপক মুদ্রা ($এম_২$) যোগান শতকরা ৮.৬৯ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময় এ বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা ১০.৩৮ ভাগ। এ সময়ে ব্যাংক ব্যবস্থায় মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ শতকরা ১১.২৬ ভাগ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে শতকরা ৯.৫৮ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ সময়ে বেসরকারি খাতে ঋণ শতকরা ১৩.৯২ ভাগ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল শতকরা ৯.৭০ ভাগ। এ সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে ঋণ প্রবাহ উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি সরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ

তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ হিসেবে তফসিলী ব্যাংকগুলোর নিকট বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন এর দায় সরকারি খাতে স্থানান্তর ও পূর্ব নির্ধারিত নিলাম পঞ্জিকা অনুযায়ী বণ্ড বিক্রয়কে উল্লেখ করা যায়।

সরকারি ঋণ ব্যবস্থাপনা

সামাজিক কল্যাণে ব্যয় নির্বাহ, অপ্রত্যাশিত জরুরী ব্যয় মোকাবেলা, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যয় নির্বাহ ইত্যাদি কারণে সৃষ্ট বাজেট ঘাটতি পূরণকল্পে সরকার অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক এ উভয় উৎস থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। বিগত কয়েক বছরে অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন উৎস থেকে সরকার কর্তৃক গৃহীত ঋণের পরিমাণ পর্যালোচনা করলে এর ধারায় কিছুটা হ্রাস/বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়। বিশেষতঃ ব্যাংক ব্যবস্থা থেকে গৃহীত সরকারের ঋণের পরিমাণে এ পরিবর্তন বেশি পরিলক্ষিত হয়। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণের পরিমাণ ৪৪১৫.৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে ৪৬৮২.৩০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের ফলে সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০৯৮.২০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের তুলনায় শতকরা ০.৫১ ভাগ কম। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থা হতে সরকারের গৃহীত ক্রমপুঞ্জিত ঋণের পরিমাণ জুন ২০০৭ এর তুলনায় ৭১৯০.৯০ কোটি টাকা বৃদ্ধি এবং জুলাই-জানুয়ারি (২০০৭-০৮)-এ ব্যাংক বহির্ভূত উৎস হতে ১৮৮১.২০ কোটি টাকা ঋণ গ্রহণের ফলে সরকারের মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৯০৭২.১০ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় শতকরা ৩২.০৫ ভাগ বেশি।

পুঁজিবাজার

ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০০৭ সালের জুন মাসের ৩২৫টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ৩৬৮টিতে দাঁড়ায়। ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ ট্রেডিং শেষে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৪,৮৮৬ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০০৭ এর ১৬,৪২৮ কোটি টাকার তুলনায় ৫১.৪৯ শতাংশ বেশি। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সাধারণ শেয়ার মূল্যসূচক ২০০৭ সালের জুন শেষে ছিল ১৭৬৪.১৮, যা ফেব্রুয়ারি ২০০৮ শেষে ২৪৭৬.৩৭ তে দাঁড়ায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা জুন ২০০৭ মাসের ২১৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০০৮ এ ২৩১টিতে দাঁড়িয়েছে। উক্ত এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধন ও ডিবেঞ্চারের পরিমাণ জুন ২০০৭ এর শেষে ৮১০৩.২৯ কোটি টাকা থেকে ১৪.২৬ শতাংশ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২০০৮ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি ৯,২৫৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জের সকল শেয়ার মূল্যসূচক জুন ২০০৭ শেষে ৫১৯৪.৭৭ -এ দাঁড়ায়, যা ফেব্রুয়ারি ২০০৮ শেষে ছিল ৭৫৩৬.৯৩ ।

সংস্কার কর্মসূচি

সামষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্হাপনায় ২০০৭-০৮ অর্থবছরে গৃহিত সংস্কারমূলক কর্মসূচি নিম্নে তুলে ধরা হলঃ

রাজস্ব খাত

- ব্যক্তি করদাতাদের করমুক্ত আয় সীমা ১,২০,০০০/- টাকা থেকে ১,৫০,০০০/-টাকায় উন্নীতকরণ;
- মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর কর হার ৪০% থেকে ৪৫% এ উন্নীতকরণ, তবে ন্যূনতম ১০% শেয়ার পাবলিক অফারের মাধ্যমে Public Traded Company-তে রূপান্তরিত হলে কর হার হবে ৩৫%;
- সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়কে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের আওতায় আনয়ন, তবে ১,৫০,০০০/-টাকা পর্যন্ত বার্ষিক সুদ আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে আয়কর কর্তন অব্যাহতি প্রদান;
- বিগত ২০০৬-০৭ অর্থবছরের চারটি শুল্ক স্তর এবং সর্বোচ্চ শুল্ক হার ২৫%, ২০০৭-০৮ অর্থবছরেও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। মধ্যবর্তী ও নিম্ন শুল্ক হার ১২% ও ৫% থেকে বৃদ্ধি করে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে যথাক্রমে ১৫% ও ১০% করা হয়েছে; এবং
- বিগত অর্থবছরে সম্পূরক শুল্কের বিদ্যমান ৬টি স্তর ছিল ১৫%, ২৫%, ৬৫%, ১০০%, ২৫০% ও ৩৫০% যা পুনর্বিন্যাস করে স্তর সংখ্যা কমিয়ে ৫টি স্তর যথাক্রমে ২০%,৬০%,১০০%,২৫০%,৩৫০% করা হয়েছে ।

মুদ্রা নীতি ও মুদ্রা ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুসৃত ২০০৮ অর্থবছরের মুদ্রানীতির অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে প্রক্ষেপিত মাত্রায় অর্থনীতির প্রকৃত প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি যুক্তিসংগত পর্যায়ে মূল্যস্তর স্থিতিশীল রাখার জন্য মুদ্রানীতির হাতিয়ারগুলোর (Instruments) সঠিক প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ। সাম্প্রতিক অতীতে দু'দফা বন্যা ও প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড়ের কারণে বিশেষতঃ কৃষিখাত এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড ব্যাহত হওয়া এবং আন্তর্জাতিক বাজারে পেট্রোলিয়ামসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্য পণ্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে অভ্যন্তরীণ মূল্যস্ফীতির উপর বিরুপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও বিনিয়োগ ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সাময়িক ধীরগতির মত অপ্রত্যাশিত অভ্যন্তরীণ অভিঘাত ও প্রতিকূল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কারণে মুদ্রানীতিতে অনুসৃত কৌশল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। উদ্ভূত অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে পর্যাপ্ত ঋণপ্রবাহ নিশ্চিত করে কৃষি খাত এবং গ্রামীণ অর্থনীতিতে গতিসঞ্চারের মাধ্যমে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি করা এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আমদানি ত্বরান্বিত করে সরবরাহ পরিস্থিতি উন্নতির মাধ্যমে মূল্যস্ফীতির হার সহনীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়াসে আলোচ্য অর্থবছরে মুদ্রানীতি অনুসরণের ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করে।

ব্যাংকি; মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

বাংলাদেশ ব্যাংক এর সংস্কার

- সুষ্ঠু মুদ্রা নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর যথাযথ তত্ত্বাবধানে আরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন এবং সর্বোত্তম আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং রীতিনীতি প্রবর্তন ও ব্যাপকভিত্তিক কম্পিউটারাইজেশন প্রক্রিয়ায় পরিচালনা দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে একটি কার্যকর, দক্ষ ও শক্তিশালী কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে "কেন্দ্রীয় ব্যাংক শক্তিশালীকরণ (Central Bank Strengthening Project)" শীর্ষক একটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

- ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক যথাক্রমে ৩০ মে, ৩১ মে ও ৫ই জুন, ২০০৭ তারিখে অগ্রণী, জনতা ও সোনালী ব্যাংককে পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ব্যবসা পরিচালনার অনুমতি প্রদান; এবং একটি ভেন্ডর চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক (ন্যাশনালাইজেশন) আদেশ, ১৯৭২ এর ২৭ক ধারার আওতায় ভূতপূর্ব রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোর সম্পদ, দায় ও মূলধন ইত্যাদি নবগঠিত পাবলিক লিমিটেড কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

বেসরকারি ব্যাংকের সংস্কার

- সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ৭৪(৪) ধারার আওতায় দি ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লিঃ (পুনর্গঠন) স্কীম, ২০০৭ প্রণয়ন করেছে এবং উক্ত স্কীমের বিধান অনুযায়ী ব্যাংকটির মূলধন বৃদ্ধি এবং আমানতকারীদের দায় হতে নির্দিষ্ট হারে আমানতকারীদের নামে শেয়ার ইস্যু করার পর অবশিষ্ট দায় পর্যায়ক্রমে পরিশোধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

- ব্যাংকের গ্রাহক সেবার মানোন্নয়ন তথা গতিশীলতা আনার লক্ষ্যে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে আধুনিকায়ন ও সময়োপযোগী করার জন্য এখন থেকে utility bill ছাড়াও রাষ্ট্রীয়, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের সব বিল, ফি ইত্যাদি পরিশোধের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে চুক্তির ভিত্তিতে সম্ভাব্য সব ক্ষেত্রে online ব্যাংকিং সুবিধা চালু/সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে পরামর্শ প্রদান;
- সরকারি সিকিউরিটিজের একটি স্পন্দনশীল ও কার্যকর সেকেণ্ডারি মার্কেট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ২০০৩ সাল থেকে ৫ ও ১০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বণ্ড (বিজিটিবি) ইস্যুকরণসহ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, মিউচ্যুয়াল ফাণ্ড প্রভৃতি দীর্ঘ মেয়াদি আমানত সংগ্রহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিনিয়োগ আকর্ষণের মাধ্যমে সরকারি

সিকিউরিটিজের একটি বেঞ্চ মার্ক Yeild Curve সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছর হতে ১৫ ও ২০ বছর মেয়াদি বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট ট্রেজারি বণ্ড (বিজিটিবি) ইস্যুর কার্যক্রম শুরুকরণ;

- প্রাইমারী ডিলার সিস্টেমকে উজ্জীবিতকরণের মাধ্যমে সেকেণ্ডারি বণ্ড মার্কেটকে আরও সক্রিয় করার লক্ষ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছর থেকে প্রাইমারী অকশনে প্রাইমারী ডিলারদের Underwriting Obligation নির্ধারণসহ তাদের Underwriting Commission ও বিশেষ তারল্য সুবিধা (Special Liquidity Support) প্রদানের ব্যবস্থাকরণ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বিশেষ Trading Window এর মাধ্যমে প্রাইমারী ডিলারদের সাথে সরকারি বণ্ড ক্রয়-বিক্রয়ের সুবিধা চালুকরণ;
- দেশে বিদ্যমান ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থার সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে অবস্থিত ইসলামিক ফিনান্সিয়াল সার্ভিসেস বোর্ড (IFSB) এর সদস্য লাভের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামী ব্যাংকিং এর নতুন বিধি-ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টিকরণ;
- মূলধন ভিত্তিকে সুসংহতকরণ ও Basel-II Accord বাস্তবায়নের নিমিত্তে ডিসেম্বর ৩১, ২০০৭ এর মধ্যে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে তাদের মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের ১০ শতাংশ মূলধন সংরক্ষণের পাশাপাশি তাদের স্থায়ী মূলধন (Core Capital) এর পরিমাণ মোট ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের সর্বনিম্ন ৫ শতাংশে নির্ধারণ;
- কোন ব্যাংক অপর ব্যাংককে অর্থায়ন (Bank to Bank Finance) ও অপর কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে অর্থায়ন (Bank to NBFI Finance) এর ক্ষেত্রে ঋণঝুঁকি নির্ণয়কল্পে যথাক্রমে ”Credit Risk Grading Manual for Banks” & ”Credit Risk Grading Manual for NBFIs” শীর্ষক ২টি পৃথক Manual প্রণয়ন;
- নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত ও পণ্যমূল্যের উর্ধ্বগতি রোধকল্পে চাল, গম, চিনি, ভোজ্য তেল (পরিশোধিত ও অপরিশোধিত), ছোলা, মটর, পেয়াজ, মশলা, খেঁজুরের আমদানি ঋণের (অর্থায়নের) ক্ষেত্রে সুদের হার সাময়িকভাবে ১২% এ নির্ধারণ;
- বাণিজ্যিক ব্যাংক এর জন্য স্থিতিপত্র বহির্ভূত উপাদানগুলোর (Off-Balance Sheet Exposures) উপর ডিসেম্বর ৩১, ২০০৭ ভিত্তিক রক্ষিতব্য প্রভিশন শতকরা ০.৫০ ভাগ এবং ডিসেম্বর ৩১, ২০০৮ ভিত্তিক রক্ষিতব্য প্রভিশন শতকরা ১.০০ ভাগ নির্ধারণ;
- ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ এর ১৩ ধারা সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশে কার্যরত সকল ব্যাংক কোম্পানীর আদায়কৃত মূলধন ও সংরক্ষিত তহবিল অন্যূন ২০০ কোটি টাকায় উন্নীতকরণ;
- জানুয়ারি, ২০০৯ এর মধ্যে Basel-II (New Capital Accord) বাস্তবায়নের নিমিত্তে Action Plan/Road map প্রণয়ন; এবং
- ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ (২০০৩ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৭(ছ) ধারা মোতাবেক কোন ব্যাংক কোম্পানি কর্তৃক তার মোট মূলধনের সর্বোচ্চ শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত কোন কোম্পানীর (সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত) বন্ড বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি।

দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র

'দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে উচ্চতর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে স্বল্পতম সময়ে দারিদ্র নিরসনে সরকার ধারাবাহিকভাবে দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র প্রণয়ন করছে। অন্তবর্তী দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র বা আইপিআরএসপি (২০০৩-০৫) এই ধারার প্রথম দলিল, যা পরবর্তীতে দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র বা পিআরএসপি (২০০৫-০৭) এবং Extended PRSP (2007-08) দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। সরকার বর্তমানে দ্বিতীয় পিআরএসপি প্রণয়নের লক্ষ্যে কাজ করছে, যা জুলাই ২০০৮ হতে তিন বছর মেয়াদে শুরু হবে। ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য আঠারটি থিমেটিক গ্রুপ গঠন করা হয়েছে এবং সকল থিমেটিক গ্রুপ তাদের প্রাথমিক দলিল পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করেছে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় পিআরএসপি প্রণয়নে এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আঞ্চলিক দারিদ্র বৈষম্য নিরসন, জেণ্ডার বৈষম্য নিরসন এবং সামাজিক বিষয়সমূহে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে।

মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো

দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রের মেয়াদকালে সামষ্টিক অর্থনীতির পরস্পর নির্ভরশীল খাতসমূহের যথাযথ স্থিতি এবং সঙ্গতিপূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে কৌশলপত্রে একটি মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামো (Medium Term Macroeconomic Framework-MTMF) সংযোজন করা হয়। মূলতঃ এ কাঠামোটি হচ্ছে পিআরএসপি মেয়াদকালে (৩ বছর) অগ্রাধিকার প্রাপ্ত খাতসমূহে সম্পদ যোগানের পরিকল্পনা। এতে জিডিপি, রাজস্ব খাত, মুদ্রাখাত ও বহিঃখাত এর মধ্যে কার্যকর সংযোগ দেখানো হয়েছে। অর্থ বিভাগ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়নের লক্ষ্যে এমটিএমএফ-কে হালনাগাদ করেছে। এতে সামষ্টিক অর্থনীতির সাম্প্রতিক গতি ধারা এবং ভবিষ্যত সম্ভাবনা ও অনিশ্চয়তার সঙ্গে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ বিবেচনা করে ৩ বছর মেয়াদি সামষ্টিক অর্থনীতির কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ চলকের প্রক্ষেপণ করা হয়েছে। সারণি **১.১** এ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোর মৌল নির্দেশকসমূহের গতিধারা ও প্রক্ষেপন দেখানো হয়েছেঃ

সারণি ১.১ঃ মধ্যমেয়াদি সামষ্টিক অর্থনৈতিক কাঠামোঃ প্রধান নির্দেশকসমূহ

নির্দেশকসমূহ	প্রকৃত	সাময়িক	সংশোধিত	প্রক্ষেপন		
	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১
প্রকৃত জিডিপি'র প্রবৃদ্ধির হার (শতাংশ)	৬.৬	৬.৫	৬	৬.৫	৭	৭.২
জিডিপি ডিফ্লেটর	৫.২	৫.৬	৮	৭.৫	৬.৫	৬
গড় মূল্যস্ফীতি (ভোক্তা মূল্যসূচকে)	৭.২	৭.২	৯	৯	৭.৫	৭
স্থূল দেশজ বিনিয়োগ (জিডিপি'র শতকরা হারে)	২৪.৭	২৪.৩	২৩.৭	২৪.৪	২৬.৩	২৭
মোট রাজস্ব	১০.৩	১০.৩	১১.৩	১১.৩	১১.৭	১১.৯
কর	৭.৮	৭.৭	৮.৬	৮.৯	৯.২	৯.৪
কর বহির্ভূত	২.২	২.২	২.৩	২	২.১	২.১
মোট ব্যয়	১৪	১৩.৫	১৬.১	১৬.৩	১৬.১	১৫.৯
চলতি ব্যয়	৯.৩	৯.৫	১১.৯	১২.২	১২	১১.৯
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	৪.৭	৪.১	৪.২	৪.২	৪.১	৪
সার্বিক বাজেট ভারসাম্য	-৩.৭	-৩.২	-৪.৮	-৫	-৪.৪	-৪
অর্থায়ন (নীট)	৩.৭	৩.২	৪.৮	৫	৪.৪	৪
অভ্যন্তরীণ অর্থায়ন	২.১	২.২	২.৩	২.৮	২.২	২
ব্যাংক ঋণ	১.৪	১.২	১.৯	২.২	১.৮	১.৭
ব্যাংক বহির্ভূত ঋণ (নীট)	০.৭	০.৯	০.৪	০.৬	০.৪	০.৩
বৈদেশিক অর্থায়ন	১.৫	১	২.৪	২.১	২.২	২
মুদ্রা ও ঋণ (বছর শেষে শতাংশে পরিবর্তন)						
নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১৯.৫	১২.৬	১৮.৫	১৭.৫	১৭.৩	১৭.১
অভ্যন্তরীণ ঋণ	২১.১	১৪.৫	২১.৬	১৮	১৮.২	১৭.৯
বেসরকারি খাতে ঋণ	১৮.৩	১৫.১	১৬	১৭	১৯	১৯
ব্যাপক মুদ্রা সরবরাহ (এম২)	১৯.৩	১৭.১	১৬.৫	১৬.৯	১৫.৮	১৫.৩
বহিস্থ লেনদেনের ভারসাম্য (শতাংশে পরিবর্তন)						
রপ্তানি (এফ,ও,বি)	১৬.৮	১৭.৮	১৭.৯	১৮.৫	১৯.৩	২০.৩
আমদানি (এফ,ও,বি)	২১.৫	২২.৯	২৪.৭	২৬.৭	২৮.৮	৩১.১
প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	৭.৮	৮.৮	৯.৮	১০.৮	১২	১৩.৪
চলতি হিসাবের ভারসাম্য (জিডিপি'র শতাংশে)	১.৩	১.৪	-০.৬	-০.৯	-১.৩	-১.৭
লেনদেনের ভারসাম্য (বিলিয়ন ইউ, এস, ডলার)						
রপ্তানি (এফ,ও,বি)	১০.৪	১২.১	১৪	১৬.৩	১৯.১	২২.৪
আমদানি (এফ,ও,বি)	১৩.৩	১৫.৫	১৯.৪	২৩.৫	২৮.৪	৩৪.৪
প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ	৪.৮	৬	৭.৫	৯.৫	১২.১	১৫.৫
স্থূল অফিসিয়াল মজুদ (বিলিয়ন ইউ, এস, ডলার)	৩.৫	৫.১	৫.৬	৬	৬.৪	৬.৫

উৎসঃ বিবিএস, বাংলাদেশ ব্যাংক ও সিজিএ ডাটা সিস্টেম, অর্থ বিভাগ।

অর্থনৈতিক খাতভিত্তিক পর্যালোচনা

কৃষি

চলতি অর্থবছরের জিডিপিতে স্থির মূল্যে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ২০.৮৭ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ২১.৩৭ শতাংশ। সার্বিক কৃষিখাতের মধ্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে জিডিপিতে কৃষি ও বনজ খাতের অবদান ১৬.২৩ শতাংশ এবং মৎস্য সম্পদ খাতের অবদান ৪.৬৪ শতাংশ। ২০০৬-০৭ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতদ্বয়ের অবদান ছিল যথাক্রমে ১৬.৬৪ শতাংশ এবং ৪.৭৩ শতাংশ।

২০০৭-০৮ অর্থবছরে খাদ্য শস্যের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৯৭.২২ লাখ মেট্রিক টন (আউশ ১৫.০৬ লাখ মেট্রিক টন, আমন ৯৬.৬২ লাখ মেট্রিক টন, বোরো ১৬৭.৩৩ লাখ মেট্রিক টন, গম ৮.২৭ লাখ মেট্রিক টন ও ভূট্টা ৯.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী আউশ উৎপাদন হয়েছে ১৫.০৬ লাখ মেট্রিক টন। বিবিএস-এর প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী বোরো ফসলের উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রাকে ছাড়িয়ে ১৭৫ লাখ মেট্রিক টন হবার সম্ভাবনা রয়েছে। বোরোর আবাদ এবছর লক্ষ্যমাত্রার তুলনায় বেশি হয়েছে। চলতি অর্থবছরে সরকারি বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ১৩.০০ লাখ মেট্রিক টন (চাল ১২.০০ লাখ মেট্রিক টন ও গম ১.০০ লাখ মেট্রিক টন)। তন্মধ্যে, ৫০ হাজার টন গম সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে গত ১ এপ্রিল'০৮ থেকে সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু হয়েছে যা অব্যাহতভাবে ৩০ জুন'০৮ পর্যন্ত চলবে; চলতি বোরো সংগ্রহ কার্যক্রম ১৬ এপ্রিল'০৮ থেকে ৩১ আগষ্ট'০৮ পর্যন্ত চলবে। বোরো ধান ও চালের সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে কেজি প্রতি যথাক্রমে ১৮ টাকা ও ২৮ টাকা। এছাড়া, চলতি অর্থবছরে সরকারি খাতে খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৮.০০ লাখ মেট্রিক টন (চাল ৪.৫ লাখ মেট্রিক টন ও গম ৩.৫ লাখ মেট্রিক টন) এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বাজেটে খাদ্য সাহায্য হিসেবে ২.১৭ লাখ মেট্রিক টন (চাল ০.৬৫ লাখ টন ও গম ১.৫২ লাখ টন) লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১ জুলাই'০৭- ১৫ এপ্রিল'০৮ সময়কালে খাদ্য সাহায্য হিসেবে আমদানির পরিমাণ ২.০৪ লাখ মেট্রিক টন (চাল ০.৬৯ লাখ মেট্রিক টন ও গম ১.৩৫ লাখ মেট্রিক টন)। এ সময়ে বেসরকারি খাতে খাদ্যশস্যের আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৫.১৩ লাখ মেট্রিক টন (চাল ১৪.৭৭ লাখ মেট্রিক টন ও গম ১০.৩৬ লাখ মেট্রিক টন)।

জাতীয় কৃষি গবেষণা ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালীকরণ, মৃত্তিকা সম্পদের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় রোধ, সেচের পানির উপযোগিতা বাড়ানো, মানসম্পন্ন বীজের সরবরাহ বৃদ্ধি, ভূমির অপব্যবহার ও ফসলের পুষ্টি ঘাটতি রোধকল্পে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ, উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচেছ। সরকার এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে এবং তা চালু রয়েছে। রোগ সনাক্তকরণ ও প্রতিরোধকল্পে ল্যাব ফ্যাসিলিটির প্রভূত উন্নয়ন সাধন এবং আধুনিক যন্ত্রপাতি বিশেষ ব্যবস্থায় সংগ্রহ করা হয়েছে। কৃষিতে বিনিয়োগের জন্য এবছর কৃষি ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ৮৩০৮.৫৫ কোটি টাকা, তম্মধ্যে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত ৬৩১৪.৭৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে এবং এ সময়ে কৃষি ঋণ আদায় হয়েছে ৪৪৪০.৩৮ কোটি টাকা।

শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্প খাতের অবদান ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে স্থির মূল্যে দেশজ উৎপাদে বৃহৎ খাতসমূহের মধ্যে শিল্প খাতের অবদান ১৭.৭৭ শতাংশ এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ২৯.৬৬ শতাংশ। স্থির মূল্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের সাময়িক হিসাবে জিডিপি'তে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের অবদান শতকরা ১৭.৮০ ভাগ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা গত বছরে ছিল ১৭.৫৫ ভাগ। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০০৭-০৮ অর্থবছরে প্রবৃদ্ধির হার শতকরা ৭.৪২ ভাগ প্রাক্কলন করা হয়েছে, যা বিগত অর্থবছরের চেয়ে ২.৩ ভাগ কম। এ খাতে প্রবৃদ্ধি অর্জনের চালিকা শক্তি হচ্ছে তৈরি পোশাক ও নীটওয়্যার শিল্প। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক মোট ৬৩৩.৪৪ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়নের জন্য বিতরণ করা হয়েছে যার মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল থেকে ৩৪১.৩৮ কোটি টাকা, আইডিএ প্রদত্ত তহবিল থেকে ১৪৪.৮৮ কোটি টাকা, এবং এডিবি প্রদত্ত তহবিল থেকে ১৫৭.১৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ সকল অর্থায়ন

সুবিধা SME খাতের উন্নয়ন কর্মসূচিকে আরো জোরদার করার পাশাপাশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে।

শিল্প খাতে ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতির পর্যালোচনা থেকে দেখা যায় যে, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে শিল্প খাতে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৪৪,০৪৬.১০ কোটি টাকা ও ৩২,৮৫৮.৯৯ কোটি টাকা, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে বিতরণ ও আদায়কৃত ঋণের তুলনায় যথাক্রমে শতকরা ১৫.৬১ ভাগ এবং শতকরা ১০.৫০ ভাগ বেশি। অপরদিকে, ২০০৭-০৮ অর্থবছরের মার্চ, ২০০৮ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ ও আদায়ের পরিমাণ যথাক্রমে ৪৩,১২৮.৮৮ কোটি টাকা এবং ২৯,৯৪৮.৩১ কোটি টাকা। শিল্প ঋণের এ সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি দেশের শিল্পায়নে গতিশীলতা আনয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে টেকসই করার পাশাপাশি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে আরও উচ্চতর মাত্রা নিশ্চিত করতে মুখ্য ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

বাংলাদেশে বর্তমানে মোট ৮টি ইপিজেড রয়েছে যথাঃ চট্টগ্রাম, ঢাকা, মংলা, কুমিল্লা, ঈশ্বরদী, উত্তরা (নীলফামারী), আদমজী ও কর্ণফুলী ইপিজেড। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ১২৬২.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ হয়েছে। এ সময়ের প্রথম ৬ মাসে প্রকৃত বিনিয়োগের পরিমান ছিল ৩৮২.১৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ইপিজেডসমূহে ২০০৬-০৭ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট রপ্তানির পরিমান ছিল ২.০৬৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি অর্থবছরে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ১২১৪.৪৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের পণ্য রপ্তানি হয়েছে।

বর্তমানে ইপিজেডসমূহে ২৬৪টি শিল্প প্রতিষ্ঠান উৎপাদনরত রয়েছে। চালু শিল্পের মধ্যে শতকরা প্রায় ২২ ভাগ তৈরি পোষাক শিল্প ও ৯.৫ ভাগ বস্ত্র শিল্প। শিল্পসমূহে মোট ২,০৩,৭৬৬ জন স্থানীয় জনবল কর্মরত রয়েছে, যার প্রায় ৬০ শতাংশ মহিলা। বাংলাদেশের ইপিজেডসমূহ বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষন, রপ্তানি, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ব্যতীত দেশের পশ্চাদসংযোগ শিল্প ও সহায়ক শিল্পে বিশেষ অবদান রাখছে।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্হা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প, বিদ্যুৎ ,গ্যাস ও পানি, পরিবহন, বাণিজ্য, কৃষি, নির্মাণ এবং সেবা খাতে ৪৪টি অ-আর্থিক রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সংস্হা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। বেসরকারি খাত উন্নয়নে অনুসৃত 'রাষ্ট্রায়ত্ত সেক্টর বেসরকারিকরণ কর্মসূচি' সত্ত্বেও রাষ্ট্রায়ত্ত খাত এখনও জাতীয় উৎপাদন, মূল্য সংযোজন, কর্মসংস্থান ও রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে । ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এসব সংস্থার পরিচালন রাজস্ব বৃদ্ধির হার ছিল ১৩.২৭ শতাংশ তবে উৎপাদন ব্যয়ের হিসেবে ২০০২-০৩ অর্থবছরে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ছিল ৩৬৬৮ কোটি টাকা, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে হ্রাস পেয়ে ১৬৫৪ কোটি টাকা হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এসকল সংস্থার নীট লোকসান ছিল ২৮৪৮.৫৫ কোটি টাকা। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে নীট লোকসান প্রাক্কলন করা হয়েছে ৪২২৮.২০ কোটি টাকা। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এ সংস্থাসমূহ লভ্যাংশ হিসেবে ২৪০.৯ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা করেছে এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এর পরিমাণ ২৭৬.৫৫ কোটি টাকা প্রাক্কলন করা হয়েছিল। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে এসকল সংস্থার নিকট মোট ডিএসএল পাওনার পরিমাণ ৬৭০৬৫.২৩ কোটি টাকা হতে জুন'০৬ পর্যন্ত আদায় হয়েছে ৫০০.৯২ কোটি টাকা। মার্চ'০৭ পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট ৪৪টি রাষ্ট্রীয় সংস্থার মোট ঋণের পরিমাণ ১৯৯৯৯.৩২ কোটি টাকা, যার মধ্যে খেলাপী ঋণের পরিমাণ হচ্ছে ৯৫১.৩১ কোটি টাকা। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের মোট পরিসম্পদের ওপর পরিচালন মুনাফার হার (ROA) ২০০২-০৩ সালে ০.৩১ কোটি টাকা হলেও ২০০৫-০৬ অর্থবছরে তা ঋণাত্মক পর্যায়ে (১.৯৫ শতাংশ) পৌঁছে । পরিচালন রাজস্বের ওপর শুধুমাত্র ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ০.২৫ শতাংশ মুনাফা অর্জিত হয় । কিন্তু ২০০৩-০৪ অর্থবছর থেকে পরিচালন রাজস্বের ওপর নীট মুনাফার হার হ্রাস পেয়ে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৭.৭৫ শতাংশে পৌঁছে। ইক্যুইটির উপর লভ্যাংশের হার ২০০২-০৩ অর্থবছরে ছিল ০.৫৬ শতাংশ, যা ২০০৫-০৬ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে ০.৭০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। সম্পদের টার্নওভার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, ২০০৫-০৬ অর্থবছরের সম্পদ ব্যবহারের দক্ষতা পূর্বের অর্থ বছর হতে কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বর্তমানে দেশের মোট জনসাধারণের মাত্র ৪৩ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। অপরদিকে, মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ মাত্র ১৬৫ কিলোওয়াট ঘন্টা, যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের তুলনায় অনেক কম। এ অবস্থার প্রেক্ষিতে, আগামী ২০২০ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যকে সামনে রেখে বিদ্যুৎ খাত সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চলতি অর্থবছরে (ডিসেম্বর'০৭ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৩,৮৭২ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ১,৩৯০ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৫,২৬২ মেগাওয়াট। সরকারি খাতের অনেকগুলো উৎপাদন ইউনিট অতি পুরাতন হওয়ায় হ্রাসপ্রাপ্ত ক্ষমতায় চালাতে হচ্ছে এবং এগুলোর নির্ভরযোগ্যতা ও প্রাপ্যতা হ্রাস পেয়েছে। চলতি ২০০৭-০৮ অর্থবছরে (ডিসেম্বর ০৭ পর্যন্ত) সর্বোচচ ৪,১৩০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভবপর হয়েছে (পিডিবি ২,৮২৬ মেগাওয়াট এবং আইপিপি ১,৩০৪ মেগাওয়াট)। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে (ডিসেম্বর, ০৭ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৭,৩৭৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা এবং বেসরকারি খাতে ৪,৯১০ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মোট ১২,২৮৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট ঘণ্টা নীট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন ২০০৬-০৭ অর্থবরে ছিল ১৬৫ কিলোওয়াট ঘন্টা। চলতি অর্থবছরে মাথা পিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন আরও বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ পূরণ করে। এ যাবৎ আবিস্কৃত ২৩টি গ্যাস ক্ষেত্রে প্রমানিত ও সম্ভাব্য উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ২০.৬৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট. ডিসেম্বর,০৭ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৭.৪০৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ডিসেম্বর ২০০৭-এ উত্তোলনযোগ্য নীট মজুদের (অবশিষ্ট) পরিমাণ ১৩.২২৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। সিএনজি ব্যবহারের সুবিধার্থে দেশে এ যাবৎ প্রায় ২০৪টি সিএনজি ফিলিং স্টেশন ও ১১০টি কনভারশন ওয়ার্কশপ চালু রয়েছে। সাম্প্রতিক হিসাব মতে দেশে ১,২৫,৭৫১টি সিএনজি গাড়ী চলাচল করছে। বর্তমানে দেশে জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ৮.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানী তেলের মূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি না করায় বিপিসি-এর মাধ্যমে সরকারকে প্রতিবছর প্রচুর অর্থ এখাতে ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। ২০০৬-০৭ অর্থবছরে এ খাতে সংস্থার লোকসান হয়েছে ২৬৪৩.৮৮ কোটি টাকা। চলতি অর্থবছরে এখাতে সরকারকে প্রায় ৪৬৩৯.৮০ কোটি টাকা ভর্তুকি দিতে হবে বলে সাময়িক হিসাবে জানা গেছে।

পরিবহন ও যোগাযোগ

বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতের গুরুত্ব অনুধাবন করে বর্তমান সরকার এ খাতের উন্নয়নে বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে সড়ক, নৌ, রেল ও আকাশ পথ এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি সমন্বয়ে পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে রাজস্ব ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মোট বরাদ্দ ৪৭২৫.৯৬ কোটি। স্থির মূল্যে ২০০৭-০৮ অর্থবছরের জিডিপি'তে পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের অবদান ১০.৪৩ শতাংশ। ২০০৭-০৮ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় মোট ১৩৪টি উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বমোট অর্থায়নের পরিমান দাঁড়িয়েছে ১৮৩৯.৭৭ কোটি টাকা।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের পল্লী ও শহর অঞ্চলে অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ও বৈদেশিক সহায়তায় ব্যাপক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করছে। এলজিইডি শুরু হতে এপ্রিল ২০০৮ পর্যন্ত প্রায় ১,১৫,৬০৬ কিঃমিঃ (কাঁচা রাস্তা ৬৪,৬৯১ কিঃ মিঃ এবং পাকা রাস্তা ৫০,৯১৫ কিঃ মিঃ) উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে ৫,৯৫,১৭৮ মিটার ব্রীজ/কালভার্ট নির্মিত হয়েছে।

দেশের উত্তরাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সরাসরি যাতায়াত ব্যবস্থার শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার জন্য যমুনা নদীর উপর যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মিত হয়েছে। সড়ক পথে দেশে উৎপাদিত পণ্যের সুষম বন্টন এবং

যাত্রী পরিবহনের ক্ষেত্রে যমুনা বহুমুখী সেতু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। যমুনা বহুমুখী সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ১ কোটি টাকা এবং ২০০৭-০৮ অর্থবছরের এপ্রিল'০৮ পর্যন্ত ১৮২.২৮ কোটি টাকা। সরকার পদ্মা নদীর ওপর সেতু বাস্তবায়নের কাজে হাত দিয়েছে। এ সেতুর দৈর্ঘ্য হবে ৫.৫৮ কি. মি. এবং ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে মোট ১০,১৬১.৭৫ কোটি টাকা। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ হতে প্রয়োজনীয় তহবিল যোগান সাপেক্ষে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর নাগাদ এ সেতুর প্রকৃত নির্মাণ কাজ শুরু হবে এবং ২০১৪-১৫ অর্থবছরের মধ্যে তা সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

অবাধ তথ্য প্রবাহের যুগে বর্তমান বিশ্বের সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন এবং এর মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ তার ও টেলিফোন বোর্ড বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। বিটিআরসি'র তথ্যমতে দেশের বেসরকারি ছয়টি সেলুলার মোবাইল অপারেটর কোম্পানির মে ২০০৮ পর্যন্ত মোট গ্রাহক সংখ্যা ৪.২০ কোটি। ফিক্সড ফোনের সংখ্যা ১২.৫৫ লক্ষ এবং মার্চ ২০০৮ পর্যন্ত টেলি ঘনত্ব ২৭.৯১ শতাংশ। সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগে ই-গভর্নেন্স চালুর লক্ষ্যে সীমিত বাজেটে প্রতিটি মন্ত্রণালয়/বিভাগে নিজস্ব ওয়েবসাইট খোলা এবং এতে সকল পাবলিক ডকুমেন্টস ও ফরমস্ পোস্ট করার ব্যবস্থা নিয়েছে, যাতে করে জনসাধারণ সহজেই অনলাইন সার্ভিস পেতে পারে। বর্তমানে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়াসহ বিশ্বের অনেক দেশে সফটওয়্যার এবং আইটি এনাবলড সার্ভিসেস রপ্তানি করছে। বাংলাদেশের সফটওয়্যার ব্যবহারকারী কয়েকটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান হলো নকিয়া, জাপান এয়ারলাইনস, বিশ্বব্যাংক, এইচপি, মার্কিন পোস্টাল/এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ইত্যাদি।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

জাতিসংঘের সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহে (এমডিজি) মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এমডিজি'র সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরকার অনুমোদিত দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের আলোকে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মানব সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যম হিসেবে শিক্ষা বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, স্বাস্থ্য সেবা এবং সমাজ কল্যাণমূলক কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করে, এ সকল সামাজিক খাতে সরকার মোট বাজেটের শতকরা ২০ ভাগের বেশি হারে অর্থ বরাদ্দ করে আসছে।

মানব সম্পদ উন্নয়নের মৌলিক উপাদান হিসেবে শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। এর ফলে প্রাথমিক স্তরে বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর হার প্রায় ৫০ঃ৫০ এ উন্নীত হয়েছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শতকরা ৬০ ভাগ মহিলা শিক্ষক নিয়োগের বিধি প্রবর্তনের ফলে মহিলা শিক্ষকের হার ২০০১ সালের ৩৭.৬ শতাংশ থেকে বর্তমানে ৪৯.৭৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারের প্রেক্ষাপটে ২০১৫ সালের মধ্যে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দারিদ্র বিমোচন কৌশলে বিদ্যালয়ে ভর্তি, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি ও ছাত্র শিক্ষক সংযোগ ঘন্টা বৃদ্ধির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে পাবলিক পরীক্ষায় নকল বন্ধ এবং অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

গত দশকে দেশের স্বাস্থ্য খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রজণন হার ও মৃত্যু হার কমেছে। গড় আয়ুসহ নবজাত শিশু ও মাতৃ-মৃত্যু হ্রাসে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবায় অর্জিত সাফল্য অব্যাহত রেখে এ খাতের আরও উন্নয়নের জন্য ২০০৩-২০১০ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি (HNPSP) বাস্তবায়ন অব্যাহত রয়েছে। সরকার 'সংশোধিত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচি' এর সমস্ত কার্যক্রম স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যান মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদপ্তর, পরিদপ্তর ও সংস্থা ছাড়াও বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। স্বাস্থ্য খাতের কর্মসূচির বাস্তবায়ন জোরদারকরণের ফলে ইতোমধ্যে মাতৃ ও শিশু মৃত্যু ও অপুষ্টির হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়েছে।

নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ এবং নারীকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের যুব সমাজকে দক্ষ ও

উৎপাদনমুখী শক্তিতে রূপান্তরের লক্ষ্যে দেশব্যাপী বেকার যুবকদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও ঋণ সহায়তা প্রদানের ব্যাপক কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিংসহ কম্পিউটার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষতঃ ক্রিকেটে সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে আগামী ২০১১ সালে এশিয়ায় অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার সাথে যৌথভাবে আয়োজনের স্বাগতিক দেশের মর্যাদা লাভ করেছে। এছাড়া দুঃস্থ, দরিদ্র, অসহায়, প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধসহ সমাজের অনগ্রসর বিভিন্ন শ্রেণীর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য প্রচুর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মান বৃদ্ধির কর্মসূচি জোরদার করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রম গ্রহণের ফলে মানব সম্পদ উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত UNDP'র মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০৩ সাল থেকে পর পর পাঁচবার বাংলাদেশ, শ্রীলংকা ও ভারতের ন্যায় মধ্যম পর্যায়ের (Medium Human Development) দেশ হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

দারিদ্র বিমোচন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত খানা আয় ও ব্যয় জরিপ ২০০৫-এর তথ্যানুসারে মৌলিক চাহিদা ব্যয় পদ্ধতিতে (Cost of Basic Needs-CBN) ২০০০ সালে দারিদ্রের হার ছিল ৪৮.৯ শতাংশ, যা ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়ে ৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। জরিপে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ ক্যালরী গ্রহণ (Direct Calorie Intake) পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় পর্যায়ে ২০০০ সাল অনপেক্ষ দারিদ্রের হার ছিল ৪৪.৩ শতাংশ, যা ২০০৫ সালে হ্রাস পেয়ে ৪০.৪ শতাংশে দাঁড়ায়। একই সময় চরম দারিদ্রের (Hard-core poverty) ক্ষেত্রেও নিম্নমুখী প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই জরিপে বিভাগওয়ারি দারিদ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, মাথা গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে অন্যান্য বিভাগের চেয়ে বরিশাল বিভাগে দারিদ্রের হার সবচেয়ে বেশী (৩৫.৬ শতাংশ) এবং চট্টগ্রাম বিভাগে সবচেয়ে কম (১৬.১ শতাংশ)। এরপরই ঢাকা ও সিলেট বিভাগের অবস্থান। উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে মাথা গণনা অনুপাতে দেখা যাচ্ছে যে, এ সময় গ্রামীণ দারিদ্র উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। ঢাকা বিভাগের গ্রাম এলাকাগুলোর দারিদ্র ২০০০ সালের ৫৫.৯ শতাংশের তুলনায় ২০০৫ সালে ৩৯.০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মাথা গণনা অনুপাতে দারিদ্র হ্রাসের হার শহরাঞ্চলেও লক্ষ্যণীয়, যা ২০০০ সালে ২৮.২ শতাংশ হলেও ২০০৫ সালে তা ২০.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। দারিদ্র প্রবনতা খুলনা বিভাগে কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমির মালিকানার ভিত্তিতে ২০০৫ সালে উচ্চ দারিদ্র রেখা ব্যবহার করে দারিদ্র পরিমাপে দেখা যায় যে, ৪৬.৩ শতাংশ জনগন ভূমিহীন এবং মাথা-গণনা অনুপাতে নিম্ন দারিদ্র রেখার ক্ষেত্রে দারিদ্র পরিমাপে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ৩৯.২ শতাংশের জমির পরিমাণ ০.০৫ একরের নীচে। মাথা পিছু মাসিক আয়, ব্যয় ও ভোগব্যয় পরিস্থিতি বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয়, ব্যয় এবং ভোগব্যয় পূর্ববর্তী বছরগুলোতে ক্রমবর্ধমান। খানার মাসিক নামিক (Nominal) আয় ২০০৫ সালে জাতীয় পর্যায় ৭২০৩ টাকা হলেও পল্লী এলাকায় তা ৬০৯৬ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১০৪৬৩ টাকা। গড় মাসিক ব্যয় অনুমিত হয়েছিল ৬১৩৪ টাকা, যা পল্লী অঞ্চলে ছিল ৫৩১৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ছিল ৮৫৩৩ টাকা। ২০০৫ সালে খানার মাথাপিছু মাসিক নামিক (Nominal) ভোগব্যয় জাতীয় পর্যায়ে ৫৯৬৪ টাকা অনুমিত হলেও পল্লী এলাকায় তা ৫১৬৫ টাকা এবং শহরাঞ্চলে তা ছিল ৮৩১৫ টাকা ।

দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলে অতি দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও প্রত্যক্ষ দারিদ্র বিমোচনের লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর কর্মসূচি অব্যাহত রয়েছে। এগুলোর মধ্যে নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান কর্মসূচি, খাদ্য সাহায্য কর্মসূচি, দারিদ্র বিমাচনে বিশেষ কর্মসূচি, আত্ম-কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য। এ সব কর্মসূচিতে বয়স্ক দরিদ্রদের জন্য বয়স্ক ভাতার ক্ষেত্র ১৭ লক্ষ সুবিধাভোগী, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতার ক্ষেত্রে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার এবং অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার ক্ষেত্রে ১ লক্ষ উপকারভোগী প্রত্যক্ষভাবে আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে। এছাড়া, প্রাথমিক শিক্ষা উপ-বৃত্তি প্রকল্পে ৫৫ লক্ষ অতি দরিদ্র শিশু উপকৃত হচ্ছে। আবাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ৬৫ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল পরিবারের জন্য স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা, আয়বর্ধক কার্যক্রমসহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। দেশের প্রধান নয়টি এনজিও ডিসেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত ৬০২০৭.১৮ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করেছে। এছাড়া, ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক ৩৬৬৩০.০ কোটি টাকা, ডিসেম্বর

২০০৭ পর্যন্ত পিকেএসএফ এবং বিআরডিবি যথাক্রমে ৪৯৩৩.৩৭ কোটি টাকা এবং ৬৪৩৩.৯৩ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে। তফসিলী ব্যাংকসমূহ একই সময় ১২৪৮৫.৩৫ কোটি টাকা, অন্যান্য বাণিজ্যিক বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহ ৩০১৩০২.৬ কোটি টাকা এবং সরকারের প্রশাসনিক বিভাগসমূহ ৯৭৬৩.৯৫ কোটি টাকা ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিতরণ করেছে।

বেসরকারিখাত উন্নয়ন

মুক্ত বাজার অর্থনীতিতে বেসরকারি খাত চলমান অর্থনৈতিক গতিকে সমুন্নত রাখতে সহায়ক চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে আসছে। অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের নিমিত্তে সরকার বেসরকারি খাতের বিকাশের জন্য উদারীকরণ ও যুগোপযোগী কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। চলতি অর্থবছরে সাময়িকভাবে প্রাক্কলিত স্থূল দেশজ উৎপাদে যেখানে জাতীয় বিনিয়োগ শতকরা প্রায় ২৪.১৬ ভাগ; সেখানে বেসরকারি বিনিয়োগ শতকরা ১৯.১৫ ভাগ প্রাক্কলন করা হয়েছে। বিনিয়োগ বোর্ড ও প্রাইভেটাইজেশন কমিশন গঠন এবং পুঁজি বাজার উন্নয়নে ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে বেসরকারি বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান ও অবকাঠামো স্থাপন করছে।

১৯৯৩ সালে বেসরকারিকরণ বোর্ড (বর্তমানে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন) গঠনের পর থেকে এ পর্যন্ত মোট ৭৪টি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে ৫৪টি প্রতিষ্ঠান সরাসরি বিক্রির মাধ্যমে এবং ২০টি প্রতিষ্ঠান/কোম্পানি শেয়ার বিক্রির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ করা হয়েছে। ২০০৭-০৮ অর্থবছরে বিটিএমসির ৪টি মিল চিত্তরঞ্জন কটন মিলস, টাঙ্গাইল কটন মিলস, মাগুরা টেক্সটাইল মিলস এবং রাঙ্গামাটি টেক্সটাইল মিলস বেসরকারি আইন ও নীতিমালার আলোকে প্রাইভেটাইজেশন কমিশন কর্তৃক বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে।

ব্যক্তিখাতে তৈরি পোষাক ও নিটওয়্যার শিল্পের অভূতপূর্ব বিকাশ শিল্প খাতকে গতিশীল করে তুলছে এবং দেশে বিনিয়োগ-সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। ফলে এ খাতে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হয়েছে। বেসরকারি ৬টি সেলুলার মোবাইল টেলিকম অপারেটরের মধ্যে সেবা প্রদানে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। দেশে মোবাইল টেলিডেনসিটি জানুয়ারি ২০০২ সালে যেখানে ছিল ১.০০ শতাংশ, মার্চ ২০০৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ২৭.৯১ শতাংশ। বর্তমানে বেসরকারি মালিকানাধীন ৪৩টি সাধারণ বীমা কোম্পানি ও ১৭টি জীবন বীমা কোম্পানি বীমা ব্যবসায় নিয়োজিত রয়েছে। সাধারণ বীমা খাতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও ৪৩টি বেসরকারি বীমা কোম্পানি ২০০৬ সালে সম্মিলিতভাবে ৯০৭.১৭ কোটি টাকা প্রিমিয়াম আয় করেছে। বর্তমানে দেশে রেজিস্ট্রিকৃত ২৬টি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ এবং ৮টি ডেন্টাল কলেজ এবং ৩৩,৭২৭ টি শয্যাসহ ২,১১৪টি বেসরকারি হাসপাতাল এবং এর পাশাপাশি ৪,৫০৯টি উন্নতমানের ডায়াগনস্টিক সেন্টার, হার্ট ফাউন্ডেশন, ক্যান্সার হাসপাতাল এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে এনজিওদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কর্মসূচির আওতায় এইচআইভি/এইডস ও পুষ্টি কার্যক্রম বাস্তবায়নে এনজিওসমূহ ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত রয়েছে। দেশে বর্তমানে কটন স্পিনিং মিলের সংখ্যা ৩২২টি, তন্মধ্যে বেসরকারি খাতে ২৯৯টি মিল রয়েছে। নীটিং ও ডাইয়িং ইউনিটসমূহ রপ্তানীমুখী পোশাক শিল্পের প্রয়োজনীয় বস্ত্রের প্রায় ৮০ শতাংশ সরবরাহ করছে। বস্ত্র খাতের সিংহভাগ শিল্প কারখানাই ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে।

পরিবেশ ও উন্নয়ন

সরকার দেশের পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সকল প্রকার জাতীয় সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারকল্পে সর্বস্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করে গণসচেতনতা সৃষ্টিসহ আইনগত বাধ্যবাধকতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে জাতীয় ভূমি ব্যবহার নীতি, জাতীয় পানি নীতি, জাতীয় পরিবেশ নীতি, জাতীয় পরিবেশ আইন ও বিধিমালা, জাতীয় বন নীতি এবং জাতীয় কৃষি নীতি ইত্যাদি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে স্বাক্ষরিত কনভেনশন, প্রটোকল, চুক্তির অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাসচালিত যানবাহনে ক্যাটালাইটিক কনভার্টার, অক্সিডেশন ক্যাটালিস্ট ও ডিজেল পার্টিকুলেট ফিল্টার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা; কমপ্রেস পদ্ধতির পরিবেশ-বান্ধব ব্লক ইট প্রচলন উৎসাহিত করা; সনাতন পদ্ধতির ইট ভাটায় ১২০ ফুট উচ্চতার স্থায়ী চিমনি স্থাপন বাধ্যতামূলক করা; পাহাড়সমূহ অবৈধভাবে কর্তন রোধকল্পে ব্যবস্থা গ্রহণ; তীব্র দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে Effluent Treatment Plant স্থাপন করার পরই পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত এলাকা সৃষ্টি, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় জাতীয় কৌশল প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ, ন্যাশনাল বায়োসেফটি ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন, বায়োমেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ ও ক্লিনিক্যাল বর্জ্য পরিবেশ সম্মত উপায়ে ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ, মিডিয়ার মূলধারায় পরিবেশ বিষয়কে প্রাধান্য প্রদান, তৃণমূল পর্যায়ে পরিবেশগত সচেতনতা বৃদ্ধি ও পরিবীক্ষণ ইত্যাদি পদক্ষেপ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সহায়তা করছে।

নতুন শতাব্দীতে বন বিভাগ নিসর্গ সহায়তা প্রকল্পের মাধ্যমে প্রাকৃতিক বন ও প্রকৃতি রক্ষায় 'সহ-ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' প্রবর্তন করেছে। উক্ত পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক বন রক্ষায় বন বিভাগ বনের আশে পাশে বসবাসকারী জনগণকে সম্পৃক্ত করেছে। বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্যতা রক্ষার জন্য ২২৫২.৪৬ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত বরেন্দ্র এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনয়নকল্পে বনায়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে বরেন্দ্র এলাকার পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে। পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তর পরিবেশ দূষণরোধ, বন ব্যবস্থাপনা, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা, ইকো-পার্ক প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে সরাসরি জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়নে অবদান রাখছে।

বিশ্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য অস্বাভাবিক হারে বৃদ্ধি ও খাদ্যশস্য বিশেষ করে চাল ও গমের মূল্য বৃদ্ধির ফলে বিশ্ব অর্থনীতিতে ২০০৭ সালে ৩.৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যা ২০০৬ সালে ছিল ৩.৭ শতাংশ। অন্যদিকে মার্চ ২০০৮ এ প্রকাশিত Asian Development Outlook, প্রতিবেদনে উন্নয়নশীল এশিয়ার প্রবৃদ্ধি ২০০৮ সালে ৭.৬ এবং ২০০৯ সালে ৭.৮ শতাংশে উন্নীত হবে বলে পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে। তবে এই প্রাক্কলন ২০০৭ সালে অর্জিত প্রবৃদ্ধির (৮.৭ শতাংশ যা গত ১৯ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ) তুলনায় কিছুটা কম। ডব্লিউওটি'র হিসাব অনুযায়ী ২০০৭ সালে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রায় তিন গুণ বেশি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র নেপাল (২.৩%) ছাড়া সবগুলো দেশেরই জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৬ শতাংশের ওপরে অর্জিত হয়েছে। ২০০৭ সালে দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ছিল যথাক্রমে ৮.৭ শতাংশ, ৭.০ শতাংশ ও ৬.৭ শতাংশ।

ইউরো অঞ্চলের অভ্যন্তরীন চাহিদা বৃদ্ধি, জাপানের অব্যাহত প্রবৃদ্ধি এবং উন্নয়নশীল দেশসমূহ বিশেষভাবে চীন ও ভারতের দ্রুত প্রবৃদ্ধি ও কতিপয় স্বল্প আয়ের দেশসমূহে অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধিই বিশ্ব অর্থনীতির এ প্রবৃদ্ধি অর্জনে গতিশীলতা এনেছে। একই সময়ে দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনীতিও দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি, বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার, উচ্চ রেমিট্যান্স প্রবাহ দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের প্রবৃদ্ধি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

বিশ্ব বাণিজ্য পরিস্থিতি

২০০৭ সালে বিশ্ব বাণিজ্যের আয়তনে (World Trade Volume) প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৭.৫ শতাংশ, ২০০৬ সালে যা ছিল ১০.১ শতাংশ। ২০০৮ ও ২০০৯ সালে এ হার হ্রাস পেয়ে যথাক্রমে ৭.০ এবং ৭.৭ শতাংশ হবে বলে World Economic Outlook, March 2008 এ পূর্বাভাস দেয়া হয়েছে।

জিডিপি এবং অঞ্চলভিত্তিক পণ্য আমদানি-রপ্তানি সারণি ১.২-এ দেখানো হ'ল।

সারণি ১.২ঃ জিডিপি এবং অঞ্চলভিত্তিক পণ্য আমদানি-রপ্তানি
(স্থির মূল্যে বার্ষিক % পরিবর্তন)

	জিডিপি			রপ্তানি			আমদানি		
	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৫	২০০৬	২০০৭	২০০৫	২০০৬	২০০৭
বিশ্ব	**৩.৩**	**৩.৭**	**৩.৪**	**৬.৫**	**৮.৫**	**৫.৫**	**৬.৫**	**৮.০**	**৫.৫**
উত্তর আমেরিকা	৩.১	৩.০	২.৩	৬.০	৮.৫	৫.৫	৬.৫	৬.০	২.৫
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	৩.১	২.৯	২.২	৭.০	১০.৫	৭.০	৫.৫	৫.৫	১.০
দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকা [১]	৫.৬	৬.০	৬.৩	৮.০	৪.০	৫.০	১৪.০	১৫.০	২০.০
ইউরোপ	১.৯	২.৯	২.৮	৪.০	৭.৫	৩.৫	৪.৫	৭.৫	৩.৫
ইউরোপীয় ইউনিয়ন(২৭)	১.৮	৩.০	২.৭	৪.৫	৭.৫	৩.০	৪.০	৭.০	৩.০
সিআইএস'ভুক্ত দেশসমূহ	৬.৭	৭.৫	৮.৪	৩.৫	৬.০	৬.০	১৮.০	২১.৫	১৮.০
আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য	৫.৬	৫.৫	৫.৫	৪.৫	১.৫	০.৫	১৪.৫	৬.৫	১২.৫
এশিয়া	৪.২	৪.৭	৪.৭	১১.০	১৩.০	১১.৫	৮.০	৮.৫	৮.৫
চীন	১০.৪	১১.১	১১.৪	২৫.০	২২.০	১৯.৫	১১.৫	১৬.৫	১৩.৫
জাপান [২]	১.৯	২.৪	২.১	৫.০	১০.০	৯.০	২.৫	২.৫	১.০
ভারত	৯.০	৯.৭	৯.১	২১.৫	১১.০	১০.৫	২৮.৫	৯.৫	১৩.০
এনআইসিজ দেশসমূহ [৩] (৪)	৪.৯	৫.৫	৫.৬	৮.০	১২.৫	৮.৫	৫.০	৮.৫	৭.০

উৎসঃ ডব্লিউটিও সেক্রেটারিয়েট এবং http://www.wto.org/english/news_e/pres08_e/pr520_e.htm (Access on 20 May 2008)

১/ ক্যারিবীয় দেশসমূহ অন্তর্ভূক্ত।

২/ Trade volume data are derived from customs values deflated by standard unit values and an adjusted price index for electronic goods.

৩/ হংকং, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, সিংগাপুর এবং চীনা তাইওয়ান।

মূলত আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের মূল্যবৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ও অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধির কারণে উন্নত দেশসমূহের তুলনায় উন্নয়নশীল দেশসমূহে মূল্যস্ফীতির হার উল্লেখযোগ্য হারে বেশি। প্রবৃদ্ধি অর্জনের পাশাপাশি দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোকে ক্রমবর্ধমান মূল্যস্ফীতি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০০৭ সালে ভারত, পাকিস্তান ও শ্রীলংকার মূল্যস্ফীতির হার ছিল যথাক্রমে ৪.৪ শতাংশ, ৭.৮ শতাংশ ও ২০.২ শতাংশ।